Vol. 45 | No. 1 | 2001

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

# ইসলাম-পূর্বযুগে আরবী গদ্য সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য


| | |
|---|---|
| Volume | 45 |
| Issue | 1 |
| Year | 2001 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ |
| Published online | October 1, 2001 |
| DOI | 10.62328/sp.v45i1.2 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v45i1.2 |
| Pages | ৬১-৭৪ |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

Check for updates

# ইসলাম-পূর্বযুগে আরবী গদ্য-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ*

মোঃ নজরুল ইসলাম খান**

আরবী বিশ্বের একটি প্রাচীন ও কালজয়ী ভাষা। জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক ছয়টি অফিসিয়াল ভাষারও একটি আরবী। বর্তমান বিশ্বের ৩৫০টি ভাষার মধ্যে আরবীর স্থান অনেক ঊর্ধ্বে। বিশ্বের ২২টি দেশে সরকারী ভাষারূপে এটি ব্যবহৃত হচ্ছে, কালের প্রবাহ কখনো এর মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে ক্ষুণ্ন করতে বা অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে পারেনি। এই ভাষায় রয়েছে স্থিতিস্থাপকতা ও গতিশীলতার এক বিস্ময়কর সমাহার। বিশ কোটির অধিক মানুষের নিজভাষা আর শতাধিক কোটি মানুষের ধর্মীয় ভাষারূপে আরবীর স্থান অতুলনীয়। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল হওয়ায় এ ভাষার মর্যাদা ও গুরুত্ব আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। আরবী দু'হাজার বছরের প্রাচীন সাহিত্য। অন্য সাহিত্যের ন্যায় আরবী সাহিত্যের প্রধান দু'টি ধারা হলো, গদ্য ও পদ্য। যে-কোন ভাষাতেই গদ্যের জন্ম হয় প্রথমে। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন ও মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য মানুষ তুচ্ছ ও বৃহৎ ব্যাপারে অবলীলাক্রমে ভাষা ব্যবহার করে থাকে, আর সে ভাষা সাধারণতঃ গদ্যে লিখিত হয়। কেননা গদ্যে ভাবের আদান প্রদান খুব সহজে সাধিত হয়। তবে পৃথিবীর অনেক ভাষার ন্যায় আরবী সাহিত্যেও প্রথমে পদ্যের উন্মেষ ঘটে। তৎকালীন সময়ে লিখে রাখার ব্যবস্থা না থাকার কারণে প্রায়শঃ স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করতে হতো। আর গদ্যের চেয়ে পদ্যে মুখস্থ করা সহজ ছিল। তাই বলা যায়, আরবী সাহিত্যে গদ্যের আবির্ভাব পদ্যের পরেই ঘটেছে। ইসলাম-পূর্ব যুগে গদ্যের যে সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তা প্রধানতঃ প্রবাদ-প্রবচন, বাগ্মিতা ও অসিয়ত-(অন্তিম উপদেশ) এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এছাড়া জ্যোতির্বিদ্‌দের ভবিষ্যদ্বাণী, কিছু লোককাহিনী, পুরোহিত ও যাদুকরদের ব্যবহৃত ছন্দোবদ্ধ ভাষাকেও গদ্য সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়। তবে এগুলোর

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

** প্রাবন্ধিক, গবেষক।

নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা বেশ দুরূহ ব্যাপার। আরবী গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসকে দুই ভাগে বিভক্ত করে আলোচ্য প্রবন্ধে কেবল সুপ্রাচীন তথা ইসলাম-পূর্ব যুগের গদ্য সাহিত্য ও এর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

ইসলামের চিরায়ত সাহিত্যে আরবের ইসলাম-পূর্ব যুগ 'আইয়ামে জাহিলিয়া'[১] বলে অভিহিত। এ সময়ে আরবের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত নৈরাজ্যকর। এ যুগে গদ্য সাহিত্যের ব্যবহার ছিল অপ্রতুল। শৈল্পিক মানসমৃদ্ধ গদ্যের অস্তিত্ব ছিল বলে ইতিহাসে যে প্রমাণ পাওয়া যায় তাও স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা ও ছন্দমিলের অভাবে যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়নি।[২] জাহেলি যুগে সাহিত্য মানে কবিতাকেই মনে করা হতো। কবিতায় আরবদের সমাজ জীবন ও ব্যক্তি জীবন সুন্দরভাবে চিত্রিত হতো।[৩] এ সময়ে গদ্য সাহিত্যের তেমন প্রচলন লক্ষ্য করা যায় না। ছন্দবদ্ধ গদ্য ছাড়া সাহিত্যের অন্য ধারা বিশেষভাবে মূল্যায়িত হতো না।

গদ্যকে আরবীতে 'নাসর' আর ইংরেজীতে Prose বলে। আরবী অভিধানে নাসর শব্দটি নযম (কবিতা) শব্দের বিপরীত শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অর্থ ঃ ব্যাপকতা, বিস্তৃতি, বিক্ষিপ্তভাবে ছুঁড়ে মারা, আধিক্য ইত্যাদি। এ দৃষ্টিকোণ থেকে পাকস্থলীর বিক্ষিপ্ত খাদ্যের সাথে তুলনা করে, অতীব বিক্ষিপ্ত কথাকে আরবী ভাষায় 'নাসর' বলে। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যাপক প্রয়োগের প্রতি লক্ষ্য করে পৃথক পৃথক কথামালাকে 'নাসর' বা গদ্য নামে আখ্যায়িত করা হয়।[৪] আরবী সাহিত্যের পরিভাষায় নাসর হচ্ছে, এমন সুবিন্যস্ত সুসজ্জিত রচনাশৈলী ও সাহিত্যরীতি যাতে ছন্দমিল ও অন্তমিল অনুপস্থিত।[৫] অন্যভাবে বলা যায়, নাসর সাহিত্যের এমন একটি ধারা যা ভাব ও বাস্তবতার সংমিশ্রণে সমাজ ব্যবস্থাকে হৃদয়গ্রাহী করে চিত্রায়িত ক'রে। সাহিত্য সমালোচকগণ 'নাসর' -এর এ অর্থটি গ্রহণ করে আরো সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন, এটি এমন একটি ছন্দবিহীন কথামালা বা রচনা শৈলীর নাম, যা হৃদয়স্পর্শী সমৃদ্ধ শব্দাবলী ও বাক্যের সমষ্টি এবং ছন্দবদ্ধ কাব্যরীতির বিপরীত।[৬] আলমুজামুল ওয়াসিত-এর ভাষ্য মতে নাসর হচ্ছে ঃ[৭]

"الكلام الجيد يرسل بلا وزن ولا قافية"

অর্থ : ছন্দ ও অন্তমিলবিহীন সুবিন্যস্ত উৎকৃষ্ট কথামালাকে নাসর (গদ্য) বলে।

**শ্রেণী বিভাগ ঃ**

ইসলাম-পূর্ব যুগের আরবী গদ্য সাহিত্যকে মূলতঃ নিম্নোক্ত ছয়টি ভাগে বিভক্ত করা যায়। ১. আল-মুহাদাছা— কথামালা; ২. আল-কিতাবা— লেখন পদ্ধতি; ৩.

আল-খিতাবা— বাকনৈপুণ্য; ৪। আর আস্‌ছাল— প্রবাদ-প্রবচন; ৫। আল-ওয়াসিয়্যাত— অন্তিম উপদেশনামা ও ৬. সাজা আল-কাহ্যান— গণকদের ছন্দবদ্ধ বক্তৃতা ইত্যাদি।

১। **আল-মুহাদাছা** ঃ অভিধানে মুহাদাছা শব্দটির অর্থ হচ্ছে– পারস্পরিক কথা-বার্তা, আলাপ- আলোচনা ও কথোপকথন।[৮] আর পরিভাষায় আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজনীয় কথাবার্তা- আলাপ-আলোচনাকে মুহাদাছা বলে।[৯] মানুষের সমাজ জীবনে প্রতিনিয়ত সংঘটিত চলমান সমস্যা ও সম্ভাবনার বিচিত্র দিক মুহাদাছা-কথামালায় স্থান পায়। ইসলাম-পূর্ব যুগে এর প্রচলন থাকলেও আরবরা এর জন্য কোনো বিশেষ বাক্‌পদ্ধতি কিংবা সুনির্দিষ্ট শব্দ চয়ন রীতির অনুসরণ করতো না। তবে তাদের কথাবার্তায় ব্যবহৃত শব্দসম্ভার লিখিত সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দসম্ভারের সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল। শব্দ ও বাক্যালংকারের দিক দিয়েও বেশ সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। তৎকালীন সময়ে গদ্য সাহিত্যের শব্দসম্ভার মানোত্তীর্ণ থাকলেও গদ্য সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দসম্ভারেও অলংকারের প্রয়োগ দেখা যায়। এ কারণে দেখা যায়, ইসলাম-পূর্ব যুগের কথা শিল্পের নমুনা অধুনা যতটুকু পাওয়া যায়, তার বেশীর ভাগই ছিল বিশুদ্ধ শব্দসম্ভার সম্বলিত।[১০]

২. **আল-কিতাবা** ঃ অভিধান অনুসারে কিতাবা হচ্ছে— লিখন, লিপি, হস্তলিপি, লিখিত বিষয়, লেখা, রচনা ইত্যাদি।[১১] পরিভাষায় অর্থবোধক সুবিন্যস্ত কথামালা— যা সমাজের লোক- শ্রুতিতে কিংবা মুখে মুখে আলোচিত না হয়ে বরং বর্ণ ও লিপির সাহায্যে লিখিত আকারে পরবর্তী কালের জন্য সংরক্ষিত হয়েছে, তাকে 'কিতাবা' বা লিখন পদ্ধতি বলে।[১২] মক্কার কুরাইশরা ব্যবসায়ী ছিলেন বলে, ব্যবসায়িক নানাবিধ লেনদেনের কারণে লিখে রাখার প্রয়োজন হওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়াও তাদের বিভিন্ন ধরনের সুদে কারবার ছিল। এসব কাজে হিসাব-নিকাশ লিখিতভাবে হতো বলেই ধারণা করা হয়। তবে এই লিখন-পদ্ধতি ছিল একান্তই ব্যক্তিগত পর্যায়ে। সমাজে এসব লোকের সংখ্যাও ছিল নগণ্য। বেদুইনরা তো দূরের কথা ইসলামের আবির্ভাব কালে মক্কার ন্যায় শহর জীবনেও লিখতে জানা লোকের স্বল্পতা দেখে বিস্মিত হতে হয়। ঐতিহাসিক ওয়াকেদীর (মৃ.২০৭/৮২২) বর্ণনা মতে মক্কায় তখন মাত্র সতেরো জন মানুষ লিখতে জানতেন।[১৩] কবি যুর রুম্মা [ মৃ. ১০১/৭১৯-১১৭/৭৩৫-এর মাঝামাঝি) লিখতে জানলেও প্রকাশ করতেন না, কারণ লিখতে জানা সে কালে অপমানজনক মনে করা হতো।[১৪]

**৩. আল-খিতাবা ঃ** অভিধানে এ শব্দটি বক্তৃতা করা, ভাষণ দেয়া, খুতবা দেওয়া ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[১৫] পরিভাষায় খিতাবা হচ্ছে শৈল্পিক মানসমৃদ্ধ উৎকৃষ্ট পন্থায় বিন্যস্ত এমন কথামালা, যার বর্ণনা পদ্ধতি কল্পনাকে চমকপ্রদ করে এবং আলংকারিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত উৎকৃষ্ট উপমা বৈচিত্র্য উপস্থাপনা দ্বারা স্বাধীনতা ও বীরত্ব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[১৬] আরবরা বক্তৃতার মাধ্যমে বংশ-কৌলিন্য, জাতীয় গৌরব, বেদুঈন-সংস্কৃতি, বীরত্ববোধ প্রভৃতির চিত্র তুলে ধরতো। তারা প্রতিটি গোত্রের একজন সুদক্ষ বাগ্মী সৃষ্টির লক্ষ্যে বাল্যকাল থেকেই সন্তানদের বক্তৃতার প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলতো।[১৭] আরবে দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত এই দুই ধরনের বক্তৃতার প্রচলন থাকলেও সাধারণতঃ তারা সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা বেশি পছন্দ করতো। লেখা পড়া না জানার কারণে তারা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, বিবেক-বিবেচনা, শক্তি- সাহস ও নির্ভীক চিত্তের উপর বেশি নির্ভর করতো। লেখার বিশেষ প্রচলন না থাকায় তারা প্রয়োজনীয় বক্তৃতাগুলি মুখস্থ করতো। এজন্য বক্তারা সব সময় তাদের বক্তব্য কণ্ঠস্থ করার জন্য সাথে সাথে কোন যোগ্য ব্যক্তিকে সঙ্গী করে রাখতেন। ইসলাম-পূর্ব যুগে কিছু কিছু বক্তৃতা এসব লোকের মাধ্যমেই সংরক্ষিত হয়েছে— যা পরবর্তী কালে বসরা ও কুফার ভাষাবিদ্গণ এদের থেকে সেসব বক্তৃতা সংগ্রহ করে লিখিত রূপ প্রদান করেন।[১৮] আরবদের বেদুইন জীবন যাত্রায় এর যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তারা খতিবদেরকে শ্রদ্ধা করতো এবং তাদের বক্তৃতা শ্রবণ করার জন্য সদা উদ্গ্রীব থাকতো। কেননা খতিবগণ আরবদের বীরত্বের কাহিনীগুলো অতীব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতো। যুদ্ধ-বিগ্রহ ও নানাবিধ কর্মকাণ্ডে খতিবগণ তাদেরকে বক্তৃতার মাধ্যমে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাতো। গোত্রীয় লোকদেরকে যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করতে আহ্বান জানিয়ে তারা এভাবে বক্তৃতা প্রদান করতো।[১৯]

**يا معشر بكر! هالك معذور ، خير من ناج فرور ، إن الحذر لاينجى من القدر ، وإن الصبر من اسباب الظفر، المنية ولا الدنية استقبال الموت خير من استدباره، الطعن فى ثغر النحور، اكرم منه فى الاعجاز والظهور . يا ال بكر! قاتلوا فما من المنايا بد!.**

"হে বকর গোত্রের লোকেরা! জীবন রক্ষার্থে পলায়নকারীর চেয়ে অসুবিধা সত্ত্বেও মৃত্যুবরণকারী উত্তম। সতর্কতা ভাগ্যকে খণ্ডন করতে পারে না। নিশ্চয় ধৈর্য সফলতার অন্যতম শর্ত, অপমান নয়, মৃত্যুই কাম্য। পশ্চাদ্দিক দিয়ে আসার চেয়ে মৃত্যু সম্মুখ দিক দিয়ে আসাই উত্তম, আর পশ্চাতে বর্শার আঘাত খাওয়ার চেয়ে বক্ষে আঘাত খাওয়াই শ্রেয়। বকর গোত্রের লোকেরা লড়ে যাও, মৃত্যুর হাত থেকে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।"

কুস ইবন্ সাইদা আল-ইয়াদী (মৃ. ৬০০ খৃঃ) ইসলাম-পূর্ব যুগের একজন খ্যাতিমান বাগ্মী ছিলেন। নাজরানের খৃস্টান ধর্ম যাজক হিসেবে পরিচিত এই ব্যক্তি হজ্জের মৌসুমে 'উকায'[২০] মেলায় ধর্মীয় বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করতেন। জানা যায়, মুহাম্মদ (স) নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে উকায মেলায় কুস-এর বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়েছেন।[২১] কুস- এর বক্তৃতার অংশবিশেষ ছিল নিম্নরূপ :[২২]

ايها الناس! اسمعوا وعوا انه من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هوات ات ـ ليل داج، نهار ساج، وسماء ذاب ابراج، ونجوم تزهر، وبحار تزخر، وجبال مرساة، وارض مدحاة، وانهار مجرا ـ ان فى السماء لخبرا، وان فى الارض لعبرا، ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون؟ أرضوا فاقاموا؟ ام تركوا فناموا؟ يقسم فس بالله قسما لاائم فيه ـ ان لله دينا هو ارضى لكم وافضل من دينكم الذى انتم عليه انكم لتاءتون من الامر منكرا .

"হে মানুষ! তোমরা শোনো আর স্মরণ রাখো। যে জন্মেছে সে মৃত্যুবরণ করবেই, আর যে মৃত্যুবরণ করবে— সে দুনিয়া ত্যাগ করে চলে যাবে, যা হওয়ার তাই হবে। এই আঁধার রাত, এই উজ্জ্বল দিন, এই স্বচ্ছ শোভিত আকাশ, এই প্রদীপ্ত নক্ষত্ররাজি, এই তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সাগর, এই স্থির পাহাড়-পর্বত, এই বিপুল বিস্তৃত সমতল ভূমি, নিত্য প্রবাহিত নদ-নদী, এ কথারই প্রমাণ করে যে, নিশ্চয় আকাশে এক বিশেষ শক্তি আছে আর পৃথিবীতে তার নিদর্শন বিদ্যমান। বল, এই লোকগুলো কোথায় চলে যায়। যেখান থেকে ওরা আর ফিরে আসে না? তারা কি সেখানে থাকবে বলেই স্থির করছে, নাকি দুনিয়ার সবকিছু ছেড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে? কুস আল্লাহর শপথ করে বলছে, আর এ শপথে কোনো পাপ নেই, নিশ্চয় আল্লাহর রয়েছে একটি দ্বীন যে দ্বীন তোমাদের জন্য তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে নির্দিষ্ট করেছেন এবং যে দ্বীন তোমাদের দ্বীন থেকে শ্রেষ্ঠতর। তোমরা গর্হিত কাজে লিপ্ত রয়েছো।"

আকসাম ইব্ন সায়ফী নামে বাগ্মিতায় পারদর্শী আরো একজন জ্ঞানী ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। মেধা-মনন ও অভিজ্ঞতায় তার সুখ্যাতি ছিলো সর্বত্র। আরবদের বংশ তালিকা সম্পর্কে তার বিশেষ জ্ঞান ছিল। দীর্ঘজীবী এই বাগ্মী রাসূল (স)-এর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে তাঁর গোত্রের লোকদেরকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করলেও তিনি নিজে ইসলাম গ্রহণ করেছেন কিনা সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। তিনি শ্রুতিমধুর ভাষায় গভীর ও বিস্তৃত তত্ত্ব ছন্দবদ্ধ গদ্যের সাহায্যে বক্তৃতা করতে পারতেন। সরলবোধ্য যুক্তির অবতারণা ও অতিশয়োক্তিহীন বক্তব্য উপস্থাপন ছিল তার বক্তৃতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিসরার দরবারে তার প্রদত্ত বক্তব্যের অংশবিশেষ হচ্ছে;[২৩]

"ان افضل الاشياء اعاليها واعلى الرجال ملوكهم وافضل الملوك اعمها نفعا وخير الازمنة اخصبها افضل الخطباء اصدقها ـ الصدق منجاة والكذب مهواة والشر لجاجة والحزم مركب صعب والعجز مركب وطئ افة الراى الهوى ـ والعجز مفتاح الفقر وخير الامور الصبر۰"

“নিশ্চয়ই উপরের বস্তু উত্তম। উঁচু স্তরের মানুষ হলেন রাজন্যবর্গ। যার দ্বারা জনসাধারণ উপকৃত হয় তিনিই শ্রেষ্ঠ রাজা। যে বছর বেশি শস্য উৎপন্ন হয় সে বছর-ই উত্তম। সত্যবাদী বাগ্মীই শ্রেষ্ঠ বাগ্মী। সত্য মুক্তি দেয়, মিথ্যা ধ্বংস করে। মন্দ গোঁড়ামী বিশেষ। প্রজ্ঞা শক্তিশালী শকট। পরমুখাপেক্ষিতা হীনতার বাহন। কুপ্রবৃত্তি সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য বিপদ স্বরূপ। কর্মবিমুখতা দারিদ্র্যের চাবিকাঠি। ধৈর্যশক্তিই শ্রেষ্ঠ শক্তি।”

বস্তুতঃ প্রবাদ-প্রবচনের চেয়েও বাগ্মিতার মধ্যে গদ্যের নিদর্শন বিস্তৃত পরিধিতে বিদ্যমান, এর ফলে আরবদের বাগ্মিতায় ইসলাম-পূর্ব যুগের গদ্যের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। বলা যায়, সে যুগের গদ্যের আকৃতি সহজ-সরল ও ভাবাবেগমণ্ডিত। সাধারণত বাগ্মীরা রাজদরবারে, যুদ্ধের ময়দানে কিংবা মেলা গণসমাবেশ স্থলে বক্তৃতা প্রদান করতেন। এর বিষয়বস্তুও সে জন্য সময়োপযোগী মহত্ত্ব বা তুচ্ছতায় সীমাবদ্ধ। কিন্তু এসব ক্ষেত্রেও আরব বাগ্মীগণ বাকচাতুর্য ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।[২৪]

**৪. আল-আমছাল ঃ** আরবী ভাষায় আল-আমছাল শব্দটি ‘মাছাল’ শব্দের বহুবচন। অভিধানে ‘মাছাল’ শব্দের অর্থ হচ্ছে– প্রবাদ-প্রবচন, উপমা, দৃষ্টান্ত, সাদৃশ্য, সমকক্ষ, তুলনা ইত্যাদি।[২৫] পরিভাষায় একটি বাক্যের সাথে অনুরূপ আরেকটি বাক্যের উপমা দেয়াকে মাসাল বলে।[২৬] ড. আহমাদ আমিনের মতে, সমাজে প্রচলিত প্রতিটি প্রজ্ঞাপূর্ণ বাক্যকে মাসাল বলে।[২৭]

প্রবাদ প্রবচন যেন কোন ভাষায় লোক-অভিজ্ঞতার মণিমঞ্জুষা। ইসলাম-পূর্বযুগে আরবদের জীবনধারায় বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে কোনো বহিঃপ্রকাশ না ঘটলেও প্রবাদ- প্রবচনের মাধ্যমে তাদের মননশীলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আরবী প্রবাদের উন্মেষকাল অতি প্রাচীন হলেও জাহেলী বা ইসলাম পূর্বযুগেই এর প্রসার ঘটে। এ যুগে আরবরা শিক্ষা দীক্ষায় অনগ্রসর থাকলেও গদ্য সাহিত্যের অন্যান্য শাখার চেয়ে আরবী প্রবাদ সাহিত্যের দিকে তাদের প্রবল আগ্রহ ছিল। এই যুগে কবিতা অপেক্ষাও আরবী প্রবাদের শাখা অধিক প্রশস্ত ছিল। কেননা কবিগণ সাহিত্যের পরিমার্জিত ভাষায় তাদের গোত্রীয় আচার-আচরণ, শৌর্য-বীর্য, বীরত্ব, শক্তি, সাহস ও মর্যাদার

কথা কবিতার ছন্দাকারে প্রকাশ করতেন। আর প্রবাদ-সাহিত্যের উৎপত্তি সাধারণ লোকজনের বক্তব্য থেকে এবং এর অধিকাংশই অমার্জিত ভাষায় প্রকাশ লাভ করে। অবশ্য কোনো কোনো প্রবাদ-সাহিত্যের মানসম্মত মার্জিত ভাষায় ব্যক্ত হয়।[২৮] সাধারণতঃ প্রবাদ-প্রবচন গদ্যে রচিত, কিন্তু কখনও কবিতার একটি পঙক্তিও প্রবাদ হিসেবে প্রচলিত হতে দেখা যায়।[২৯] আরবী গদ্য সাহিত্যের এই শাখাটি ইসলাম-পূর্ব যুগেই সংরক্ষিত হয়েছে, প্রাপ্ত মনীষীদের প্রচেষ্টায় গ্রন্থবদ্ধও করা হয়েছে। যেমন আল-মায়দানী (মৃ.৫১৮/১১২৪) কর্তৃক সংকলিত মাজমাউল আমছাল ও যামাখশারী (মৃ. ৫৩৮/১১৪৩) সংকলিত আল-মুসতাকসা ফি আমছালিল আরবী গ্রন্থদ্বয়ে প্রায় নয় হাজার প্রবাদ সংকলন করেন। বিশ্বের অনেক সাহিত্যের চেয়ে আরবী প্রবাদ সাহিত্য উন্নততর ও সমৃদ্ধ। আরবী প্রবাদ রচয়িতাদের মতে আরবী প্রবাদ গ্রন্থের সংখ্যা আড়াই শতেরও বেশি আর প্রবাদসংখ্যা প্রায় চৌদ্দ হাজার। তবে অন্য বর্ণনা মতে, প্রবাদের এই সংখ্যা প্রায় বিশ হাজার।[৩০] এসব প্রবাদের অধিকাংশই ইসলাম-পূর্ব যুগের জীবন ধারার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আরব দেশে সর্বপ্রথম যে প্রবাদটি প্রচলন হয় বলে ধারণা করা হয় সেটি হচ্ছে;[৩১]

"المرأة عن المرء وكل أدماء من آدم"

"নারীর সৃষ্টি পুরুষ থেকে, আর সকল মানুষ আদম থেকে সৃষ্টি হয়েছে।"

আরব দেশে প্রচলিত কয়েকটি প্রসিদ্ধ প্রবাদের একটি নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

- ❖ الحب اعمى – প্রেম অন্ধ।[৩২]
- ❖ بعيد عن العين بعيد عن القلب – চোখের আড়াল হলে অন্তরেরও আড়াল হয়।[৩৩]
- ❖ إنك لاتجنى من الشوك العنب – কাটা গাছ কেটে তুমি আংগুর আহরণ করতে পারবে না।[৩৪]
- ❖ من حفر حفرة وقعها فيها – যে পরের জন্য গর্ত করে, সে নিজেই সে-গর্তে পড়ে।[৩৫]
- ❖ كما تدين تدان – যেমন তুমি দেবে তেমনি তুমি পাবে।[৩৬] (যেমন কর্ম তেমন ফল)
- ❖ السكوت نصف الرضا – চুপ থাকা অর্ধ সম্মতি।[৩৭] (চুপ থাকা সম্মতির লক্ষণ)
- ❖ اقصدى تصيدى – ইচ্ছা কর শিকার করতে পারবে।[৩৮] (ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়)

- ❖ ان للحيطان اذان – দেয়ালের কান আছে।[৩৯]
- ❖ الصديق عند الضيق – বিপদে বন্ধুর পরিচয়।[৪০]
- ❖ معاتبة الأخ خير من فقده – নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।[৪১]

**৫. আল-ওয়াসিয়্যাত** ঃ অভিধানে অসিয়ত শব্দের অর্থ হচ্ছে– উপদেশ, পরামর্শ, সুপারিশ, আদেশ, উইল ইত্যাদি।[৪২] পরিভাষায় মৃত্যুর পূর্বে কিংবা বিশেষ কোনো মুহূর্তে প্রিয়জনদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত কথামালাকে অসিয়ত বলে।[৪৩] প্রাচীন আরবে এভাবে মৃত্যুর পূর্বে কিংবা বিশেষ কোনো সময়ে প্রিয়জনদের উপদেশসম্বলিত বাণী দেয়ার প্রচলন ছিল। এই অসিয়তও এক ধরনের বক্তৃতা। তবে বক্তৃতা সামষ্টিক জনগোষ্ঠীর উদ্দেশে প্রদত্ত হয় আর অসিয়ত প্রদত্ত হয়, এক বা একাধিক ব্যক্তিকে উদ্দেশ ক'রে। অসিয়ত বা অন্তিম উপদেশের মাধ্যমে আরবী গদ্য সাহিত্যের চর্চা প্রাক ইসলামী যুগে লক্ষণীয়। এসব অসিয়ত সাধারণভাবে সংরক্ষণের তেমন কোন ব্যবস্থা না থাকলেও ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিকগণের প্রচেষ্টায় কিছু অসিয়ত সংরক্ষিত হয়েছে। ইসলাম পূর্বযুগের অসিয়তের কয়েকটি উদাহরণ এখানে উপস্থাপন করা হলোঃ

যুযাইর বিন্ জানাব আলকালবী তার সন্তানদের উদ্দেশে বলেন,[৪৪]

"يابني! قد كبرت سني وبلغت حرصا من دهري، فاحكمتني التجارب، والامور تجربة واختيار. فاحفظوا عني ما اقول وعوه. اياكم والحور عند المصائب، والتواكل عند النوائب، فان ذلك داعية للغم، وشماتة للعدو، وسوء ظن بالرب وايكم ان تكونوا بالاحداث مغترين، ولها امنين، ومنها ساخرين، فانه ماسخر قوم قط إلا أبتلوا، ولكن توقعوها. فان الانسان في الدنيا غرض تعاوره الرماة. فمقصر دونه ومجاوز لموضعه، وواقع عن يمينه وشماله، ثم لا بد ان يصيبه."

"হে বৎস! আমি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি, কালের পরিবর্তন দেখেছি এবং জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা আমাকে দৃঢ়তা দান করেছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার অপর নামই জীবন ও জীবনের কর্মসমূহ। আমি যা বলছি তা তোমরা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করো ও সংরক্ষণ করো। সাবধনা! বিপদকালে ধৈর্যহারা হয়ো না এবং নিজের কাজে অন্যের উপর নির্ভর করো না। অন্যথায় তোমরা দুঃখ পাবে, তোমাদের শত্রু খুশী হবে এবং তোমরা প্রভুর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করবে। জেনে রাখো, যুগের বিবর্তনকে অবজ্ঞা করো না, কখনও এর পরিবর্তনকে অবহেলা করো না এবং এ থেকে নিশ্চিত হয়ে থেকো না। কেননা যে জাতি কালের

গতিধারাকে অবজ্ঞাভরে দেখেছে সে জাতি বিপদে নিপতিত হয়েছে। তোমরা সময়ের বিপর্যয়ের অপেক্ষা করো। দুনিয়াতে মানুষ তীরন্দাজের লক্ষ্যস্থল বিশেষ। তীর বর্ষিত হচ্ছে, হয়তো লক্ষ্যস্থলে কোনো সময় পৌঁছে না, আবার হয়তো ডানে বামে চলে যায়, কিন্তু কোনো না কোন সময় নিশ্চয়ই একটি তীর লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবেই।"

এভাবে একজন বেদুঈন মহিলা তার নববিবাহিতা কন্যাকে অসিয়ত করতে গিয়ে বলেছেন; [৪৫]

اى بنيه! ان الوصية تركت لفضل ادب تركت لذلك منك ـ ولكنها تذكرة للعافل، ومعونة للعاقل، ولو ان امرأة استغنت عن الزوج لغنى ابويها، وشدة حاجتهما اليها، لكنت اغنى الناس .......

"হে আমার প্রিয় কন্যা! শিক্ষায় ও শিষ্টাচারে উন্নত হওয়ার কারণে কাউকে যদি অসিয়ত প্রদান করতে না হতো তবে তুমি হতে তাদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু অসিয়ত-উপদেশ অসতর্ককে সতর্ক করে এবং বুদ্ধিমানকে সহায়তা দেয়। পিতা-মাতার স্নেহ ও ধন-সম্পত্তি যদি কোন মেয়ে সন্তানকে বিবাহের মুখাপেক্ষী না করতো তবে তুমিই হতে তেমন একজন।"

**৬. সাজা আল-কাহ্হান ঃ** অভিধানে সাজা শব্দের অর্থ হচ্ছে– অন্ত্যমিলযুক্ত গদ্যাংশ, অন্ত্যমিলযুক্ত বাক্য, বাক্যের অন্তমিল, বাক বাকুম ডাকা।[৪৬] ইবনু দুরাইদ (মৃ. ৯৩৪/১৫২৭)-এর মতে, সাজাআত আল হামামা (কবুতর বাকবাকুম করছে।) থেকে সাজা শব্দের উৎপত্তি। গদ্যের সাজারীতিতে যেহেতু একই আওয়াজের বার বার আবৃত্তি হয়, সেহেতু একে সাজা বলে।[৪৭] আর কাহহান শব্দটি ইসমে ফায়িল মুবালাগা এর শব্দ। শাব্দিক অর্থ বড় গণক, ভবিষ্যৎ বক্তা, পুরোহিত, পাদরী ইত্যাদি।[৪৮] পরিভাষায় অতীতকালীন কোনো ঘটনার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতের কোনো বিষয়ের সংবাদ ছন্দবদ্ধ বক্তৃতার মাধ্যমে প্রকাশ করাকে সাজা আলকাহ্হান বলে।[৪৯] ইসলাম-পূর্ব যুগে গণকদের মাঝে এ ধরনের ছোট ছোট বাক্যসম্বলিত সাজার প্রচলন ছিল। এ বিদ্যা সম্পর্কে আরবদের ধারণা হলো তারা অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবহিত। প্রাত্যহিক জীবনের নানা বিষয় পরামর্শের জন্য তারা গণকদের কাছে যাতায়াত করতো। তাদের থেকে বিরাজমান দ্বন্দ্ব-কলহ, বিবাদ-বিসম্বাদ, স্বপ্নের ব্যাখ্যা, ভাগ্যোন্নোয়ন ও রোগমুক্তির প্রার্থনা করতো। এ সময়ে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন এমন কয়েকজনের মধ্যে শাক্ক আনামার [মৃ. ৫৭৩ খৃ.] ও সাতি আলজাবির-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৫০]

বস্তুতঃ ছন্দবদ্ধ গদ্য বা বাক্যান্তে মিলযুক্ত গদ্য ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা, জ্যোতির্বিদ, পুরোহিত ও যাদুকরদের ভাষায় ব্যবহৃত হতো। নিজেদের বক্তব্যকে দুর্বোধ্য করে তুলতে গদ্যের এ বিশেষ পদ্ধতির পরিবর্তন হতে থাকে এবং তা পরিবর্তিত হয়ে কবিতার রূপ নেয়। কুরআনে ছন্দবদ্ধ গদ্য থাকায় কাফিরগণ রাসূল (স) কে কবি বলে আখ্যায়িত করে। এ কারণে ছন্দবদ্ধ গদ্যকে কবিতার প্রথমরূপ মনে করা হয়। পরবর্তীকালে অলংকার মণ্ডিত বাগ্মিতায় সাজা তথা মিত্রাক্ষর গদ্যের প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়।[৫১]

**বৈশিষ্ট্যাবলী ঃ**

ইসলাম-পূর্বযুগের আরবী গদ্যসম্ভার সঠিকভাবে সংরক্ষিত না হওয়ায় কালক্রমে এর নমুনা পাওয়া দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায়। তৎকালীন গদ্য সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তবে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় গদ্য সাহিত্যের কিছু নমুনা বিভিন্ন গ্রন্থের মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়ে আসছে বেশ আগে থেকেই। যদিও এসব তথ্যের প্রামাণিকতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে, তথাপি, বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত গদ্য সাহিত্য পর্যালোচনা করলে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে ঃ

১. ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবী গদ্য লেখকদের লেখায় মরুবাসী আরব বেদুঈনদের জীবনাচার তথা প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তব চিত্র লক্ষণীয়। এদের জীবনাচার-ই আরবী গদ্য সাহিত্যের প্রাণ।

২. গদ্য সাহিত্য লেখকরা শব্দ চয়ন ও ছন্দ নির্মাণে পারদর্শী ছিলেন না; যে কারণে তাঁরা গদ্য রচনায় অর্থবোধক সামঞ্জস্যশীল শব্দ চয়নকে যথেষ্ট মনে করতেন।

৩. সে যুগের গদ্য লেখকগণ গদ্য রচনার ক্ষেত্রে কাহিনী তথা গণকদের ছন্দবদ্ধ গদ্যের উপর নির্ভর করতেন। কেননা তারা গণকদের বক্তব্যকে যথার্থ মনে করতেন।

৪. তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অজ্ঞতা, অস্থিতিশীলতা ও অনুভূতির উপর নির্ভর করতেন। বিভিন্ন গদ্য সাহিত্যে এর প্রমাণ রয়েছে।

৫. বাক্যের অর্থ ও তাৎপর্যের প্রতি লক্ষ্য না করে তাঁরা বাক্যকে ছোট ও সংক্ষিপ্ত করার প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করতেন। এ কারণে তৎকালীন গদ্য সাহিত্য সংক্ষিপ্ত লক্ষ্য করা যায়।

৬. তাঁদের লেখায় প্রবাদ-প্রবচন ও নানাবিধ উপদেশ লক্ষ্য করা যায়। কেননা তাঁরা প্রবাদ-প্রবচনের দ্বারা বক্তব্য উপস্থাপনকে শক্তিশালী মাধ্যম মনে করতেন।

৭. গদ্য রচনার ক্ষেত্রে তারা বড় বড় বাক্যরূপ ব্যবহার না করে ছোট ও মাধ্যম আকারের বাক্যরূপ ব্যবহার করতেন।

৮. শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁরা প্রকৃত অর্থের কাছাকাছি ঈঙ্গিতবহ শব্দ ব্যবহার করতেন। তাদের গদ্যসাহিত্যের এরূপ শব্দের ব্যবহার বেশ লক্ষণীয়।

৯. তাঁরা বিলীন হয়ে যাওয়া বাসস্থান, বংশীয় কৌলীন্য, গর্ভধারিণী ও প্রসূতি উষ্ট্রী এবং দ্রুতগতিসম্পন্ন অশ্বের বর্ণনা থেকে গদ্য সাহিত্যের রসদ সংগ্রহ করতেন। তাঁদের গদ্য সাহিত্য এ সব বর্ণনায় সমৃদ্ধ।

১০. তাঁদের গদ্য সাহিত্য রচনায় সাহিত্য-রীতির কোনো রীতি-পদ্ধতি অনুসৃত হয়নি।

আরবী সাহিত্য দু'হাজার বছরের প্রাচীন সাহিত্য। অন্যান্য সাহিত্যের ন্যায় এরও রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। পৃথিবীর আরো অনেক ভাষার ন্যায় আরবীতে সাহিত্য হিসেবে প্রথমে গদ্যের উন্মেষ ঘটে। আর মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য মানুষ সহজ পদ্ধতি হিসেবে গদ্যের উপর নির্ভরশীল হতে থাকে। পদ্য সাহিত্যের ন্যায় আরবী গদ্য সাহিত্য ইসলাম-পূর্বযুগে সংরক্ষিত হয়নি। সে কারণে জাহেলী যুগে আরবী গদ্য সাহিত্যের সঠিক ইতিহাস পাওয়া কষ্টসাধ্য। আর তৎকালীন সময়ের যেসব গদ্য-সম্ভার পাওয়া যায় তার নির্ভরযোগ্যতা ও প্রামাণিকতা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে।

<u>তথ্যনির্দেশ ঃ</u>

১. আরবী ভাষায় 'আইয়াম' শব্দটি ইয়াওমুন শব্দের বহুবচন, অর্থ ঃ যুগ। আর 'জাহেলিয়া' আরবী 'জাহলুন' মূলধাতু হতে উৎপন্ন। কর্তৃকারকরূপ শব্দের সাথে সম্বন্ধযুক্ত। অর্থঃ জ্ঞান বিবর্জিত হওয়া, কোন কিছু সম্পর্কে ভুল বিশ্বাস রাখা, যে কাজ যেভাবে করা উচিত সেভাবে না করা, রাগিব ইস্পাহানী, মুফরাদাত, (মিসর, ১৯৬১ খৃ.) পৃ. ১০২; কুরআনে জাহেলিয়া শব্দটি চার বার ব্যবহৃত হয়েছে। যথাঃ ৩ : ১৫৪, ৫ : ৫০ : ৩৩ : ৩৩, ৪৮ : ২৬; অজ্ঞানতা ছাড়াও জাহল শব্দের আরো কয়েকটি অর্থ আছে, যথা; কঠোরতা, দয়াহীনতা, বর্বরতা, রূঢ়তা, অশিষ্টতা, আল্লাহ ও আল্লাহর আইন-কানুন সম্পর্কে অজ্ঞানতা, মহান আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস, মূর্তিপূজা, মিল্লাত বা সম্প্রদায় (যে সম্প্রদায় স্বীয় প্রবৃত্তির

অনুসরণ করে)। জাহল-এর বিপরীত শব্দ ইলম ও হিলম উভয়ই। দ্রঃ সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ ১৯৮৬, ১ ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৮।

২. ড. তাহা হুসাইন, মিন হাদিসিস শিরি ওয়ান নাসরি, (কায়রো; দারুল মাআ'রিফ, ১০ম সংস্করণ), পৃ. ২৫০।

৩. আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ ১৯৮৬), পৃঃ ৩৪

৪. ইবনু মানযুর, লিসানুল আরব (বৈরুত ঃ দার ইবনে আফ্‌ফান, তাঃ বিঃ ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৪।

৫. আননাসরুল আব্বাসী, কুল্লিয়াতুল আদব, কিসমুল লুগাতিল আরাবিয়া, (জামিআতু মালিক সাউদ, ১৯৯২), ২য় অধ্যায়, পৃ. ১০।

৬. প্রাগুক্ত।

৭. মাজমাউল লুগাহ আল আরাবিয়া, আলমুজামুল ওয়াসিত, (দেওবন্দ ; যাকারিয়া বুক ডিপো, ১ম সংস্করণ ২০০১) পৃঃ ৯০১।

৮. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান, (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, চতুর্থ সংস্করণ ২০০2) পৃ. ৬৬৫।

৯. আহমাদ ইসকান্দারী, আলওয়াসিত ফিল আদাবীল আরাবি ওয়া তারিখিহী, (কায়রো : মাতবাআ আল মাআরিফ, ৭ম সংস্করণ ১৯৭৮), পৃ. ২৩।

১০. প্রাগুক্ত।

১১. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬০২।

১২. আহমদ ইসকান্দারী, প্রাগুক্ত পৃ. ২৩।

১৩. ই.জি. ব্রাউন, লিটার‍্যারী হিস্ট্রি অব পার্সিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬১।

১৪. গোল্‌ড যিয়ার, মুহম্মাডান (মুসলিম) স্টাডিজ, (ইংরেজী অনুবাদ) (লণ্ডন, ১৯৬৭), পৃ. ১০৭।

১৫. ড. মুহম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত পৃ. ৩১৭।

১৬. আহমাদ হাসান যাইয়াত, তারিখুল আদাবিল আরাবী, (বৈরুত; দারুল মাআরিফ, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৯৭) পৃ. ১৩।

১৭. প্রাগুক্ত।

১৮. ইসলাম-পূর্ব যুগের বক্তৃতা সাহিত্য সম্বন্ধে যে সব গ্রন্থে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে তন্মধ্যে ইবনুল আবদ রাব্বীহ্ -এর (মৃ. ২২৮/৯৪০) 'আলইকদুল ফারিদ' ও আলজাহিযের (মৃ. ২৫৫/৮৬৯) 'কিতাবুল বয়ান

ওয়াত তাবয়িল'-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রদত্ত বক্তৃতার নাম তারা সে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নামানুসারেই রাখতেন। যেমন কায়স ইবনু খারিজার বক্তৃতার নাম 'আলআযরা' এবং রুকিয়ার বংশধরদের বক্তৃতার নাম 'আলআজুয' ইত্যাদি। (দ্রঃ আ. ত. ম. মুছলেহউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬)।

১৯. আহমাদ হাসান আল-যায়্যাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

২০. **উকায মেলা ঃ** ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবের সাংস্কৃতিক বিকাশে উকায মেলার গুরুত্ব অপরিসীম। মক্কার অদূরে প্রসিদ্ধ স্থানে যুলকাদ মাসে এক বার্ষিক মেলা বসতো। তখন যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া কিংবা ক্রোধের বশে রক্তপাত করা নিষিদ্ধ ছিল– এ ছিল "এক ধরনের ঐশী যুদ্ধবিরতি।" উকায ছিল আরব দেশের "অলিম্পিয়া"। এখানে তারা শুধু বাণিজ্য করতেই আসতো না ; তারা আসতো তাদের পরাক্রম ও গৌরব গাঁথা ঘোষণা করতে ; কবিত্ব–শক্তি ও সাহিত্যিক প্রতিভা প্রদর্শন করতে। ফলে এ মেলায় নির্বিবাদে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চলতো। হিট্টির মতে, এ মেলা আরবের "Academic Franchise" হিসাবে কাজ করতো (দ্রঃ সৈয়দ আমীর আলী, দ্যা স্পিরিট অব ইসলাম, (বাংলা অনুবাদ) কলিকাতা ঃ মল্লিক ব্রাদার্স, নতুন সংস্করণ ১৯৯৫, পৃ. ৭৩–৭৪)।

২১. জুরজী যায়দান, তারিখুল আদাবিল (কায়রো : দারুল কলম, তাঃ বিঃ) ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৪।

২২. আহমাদ হাসান আল-যায়্যাত প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

২৩. আহমাদ ইসকান্দারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

২৪. আহমাদ হাসান আল-যায়্যাত, তারিখুল আদাবিল আরাবী, (উর্দু অনুবাদ) (লাহোর ; ১৯৬১),পৃ. ৫২।

২৫. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৬০।

২৬. আলমায়দানী, মাজমাউল আমসাল, (মিসর : দারুল কলম, ১৯৫৫ খৃ.) ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২৭. ড. আহমাদ আমীন, ফজলুল ইসলাম, (কায়রো : দারুল কলম, ১৯৪৫ খৃ), পৃ. ৬০।

২৮. ড. আহমাদ আমিন, প্রাগুক্ত পৃ. ৬৪।

২৯. যেমন ঃ وافق شن طبقة শন (পুরুষের নাম)-এর জন্য তাবকা (স্ত্রীলোকের নাম) মিলেছে। যাকে বাংলা ভাষায় আমরা বলতে পারি, যেমন কুকুর তেমন মুগুর। (দ্র ঃ আ. ত. ম মুছলে উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪) ।

৩০. বিঃ দ্রঃ ড, আ. ব. ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী, মাসাল সাহিত্য, পি. এইচ. ডি থিসিস, ১৯৯৯, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার), অপ্রকাশিত, পৃ. ২০৯-৩১১।

৩১. আলমায়দানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৯।

৩২. মুনির বালাবাক্কী, আলমাওরিদ (বৈরুত ঃ দারুল কুতুব) ১৯৮১, পৃ. ৪৯।

৩৩. বালাবাক্কী প্রাগুক্ত পৃ. ৫৪ ।

৩৪. আলমুনজিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭৪ ।

৩৫. আলমুনজিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭৪ ।

৩৬. বালাবাক্কী, প্রাগুক্ত পৃ. ৫৩।

৩৭. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৮।

৩৮. প্রাগুক্ত পৃঃ ১০৮।

৩৯. প্রাগুক্ত পৃঃ ৯১।

৪০. প্রাগুক্ত পৃঃ ৮ ।

৪১. যামাখশারী, আল-মুসতাকসা ফি আমছালিল আরব, বৈরূত : দারুল কুতুব, ১৯৭৭ খৃ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৬।

৪২. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত পৃ. ৮২৯।

৪৩. আ. ত. ম মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০।

৪৪. বিঃ দ্রঃ আহমাদ হাসান যাইয়াত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৪ ।

৪৫. প্রাগুক্ত পৃঃ ২৪ ।

৪৬. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৭।

৪৭. আলবাকিল্লানী, ইজাযুল কুরআন, (বৈরুত, : দারুল ফিকার, ১ম সংস্করণ ১৯৮৬ খৃ.) পৃ. ৮৩-৮৪ ।

৪৮. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০০।

৪৯. আহমাদ ইস্কান্দারী ,প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

৫০. প্রাগুক্ত পৃঃ

৫১. পি. কে হিট্টি, হিস্ট্রি অব দ্যা আরবস্, (লন্ডন, ১৯৪৯), পৃ. ৯২।